OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 75
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 602 - 610
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 602 - 610
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

কর্ণার্জ্জুন : দুই ভিন্ন নাট্যকারের দৃষ্টিতে

বিউটি রুদ্র
Email ID: beautyrudra0280@gmail.com

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
বাংলা নাট্য সাহিত্য, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মিনার্ভা থিয়েটার, বাণী থিয়েটার, অযোধ্যার বেগম, মগের মুলুক।

Abstract

Discussion

একই বিষয়কে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে দুই ভিন্ন কাহিনি। যার মূল ভিত্তি মহাভারতের মহাসংগ্রাম। উৎস একটাই কিন্তু সেই কাহিনিকে দুই জন স্রষ্টা যখন তাঁদের হৃদয়রসে জারিত করে উপস্থাপন করেছেন তখন তা ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। সেখানে রয়েছে দু'জনের ব্যক্তিগত অভিমত, পৃথক পৃথক দৃষ্টিকোণ। এই কাহিনির দুইজন নির্মাতা হলেন অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও কেশব সেন। বিশ শতকের প্রথমার্ধে নাটক রচনার ক্ষেত্রে তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের দুইজন নায়কের জীবনকথাতে। তাঁরা হলেন কর্ণ ও অর্জুন; মাতা কুন্তীর দুই পুত্র। সহোদর হয়েও যাঁরা চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁদের কাহিনিকে নিয়ে দুইজন নাট্যকারই রচনা করেছেন 'কর্ণার্জ্জুন' নামক দুটি নাটক। আমরা এখন ওই দুই নাটকের বিষয়বস্তু আলোচনার মধ্য দিয়ে দুইজন নাট্যকারের পৃথক পৃথক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় খুঁজে দেখার চেষ্টা করব। তুলনামূলক আলোচনার জন্য আমরা দেখে নেব দুইজন নাট্যকারের রচনার সময়কাল, তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ এবং তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনাদর্শকে। কারণ পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি স্রষ্টার সৃষ্টিকর্মকে প্রভাবিত করে থাকে খুব স্বাভাবিকভাবেই। তার ব্যতিক্রম ঘটেনি অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বা কেশব সেনের ক্ষেত্রে।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে পৌরাণিক নাটকের ধারা বিশ শতকে যাঁদের লেখনীর গুনে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৯. ০৭. ১৮৭৫ – ১৫. ০৫. ১৯০৪)। যশোহর, মতান্তরে নদীয়ার মহেশপুরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি। ছোটো থেকেই অভিনয়ের প্রতি আগ্রহ ছিল তাঁর। বিদ্যালয় জীবনে তিনি যোগ দেন শখের থিয়েটারে। তিনি গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাট্য-ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। প্রথম অভিনয় শিক্ষা তাঁর শুরু হয় অমৃতলাল বসুর কাছে। পরে গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফির কাছে অভিনয় শিক্ষা লাভ করেন। পেশাদার অভিনেতা হিসাবে মিনার্ভা থিয়েটারে যোগ দেন ১৩১১ বঙ্গাব্দে। সেখানে পরিচালকের ভূমিকাও পালন করেছিলেন। এরপর ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে জুলাই মাসে যোগ দেন স্টার থিয়েটারে। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে স্টার থিয়েটার ছেড়ে চলে যান কোহিনুর

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 75
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 602 - 610
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

থিয়েটারে। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে তারাসুন্দরীর সাথে মিলে 'বাণী থিয়েটার' নামে একটি ভ্রাম্যমান দল গড়ে তোলেন। একাধিক থিয়েটারের সাথে তাঁর সংযোগ তাঁকে ভবিষ্যতের রঙ্গমঞ্চের রং চিনতে খুব ভালোভাবে সাহায্য করেছিল।

গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর ধারাকে বজায় রেখে তিনি নাটক রচনা শুরু করেন। আমরা যদি তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটের দিকে নজর দিই তাহলে দেখতে পাবো যে এই সময় প্রাচীন আদর্শের প্রতি মানুষের আগ্রহ কমে যেতে শুরু করেছে। নতুন পদ্ধতি ও বিষয়কে অবলম্বন করে সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস দেখা গেছে। তাইতো আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস' নামক গ্রন্থে বলেছেন, -

> "এই আদর্শের ধারাটি ইতিপূর্বেই গতিশক্তি-হীন হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া ইহার মধ্যে যেমন কোন মৌলিক প্রতিভার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না, তেমনি ইহাদের কোনও প্রভাব সুদূরপ্রসারী হইতে পারে নাই - কিছুকালের মধ্যেই এই ধারাটি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তাহার ফলে এই যুগে উপন্যাসের যত নাট্যরূপ দিয়া রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতেছিল, প্রকৃত নাটক রচিত হইয়া তত অভিনীত হয় নাই।"[১]

এমন এক পরিস্থিতিতে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অবলম্বন করেছিলেন ইংরেজি নাটকের কাহিনিকে। নাটকের ক্ষেত্রে শুরু হয় তাঁর পথ চলা। তাঁর রচিত প্রথম নাটক 'রঙ্গিলা' (১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ)। এর মধ্যে অমৃতলাল বসুর 'তরুবালা' নাটকটির প্রভাব লক্ষ করা যায়। এরপর 'sign of the cross' অবলম্বনে তিনি রচনা করেন 'আহুতি' নামে একটি রোমান্টিক নাটক। রচনা করেছিলেন 'শুভদৃষ্টি' নাটকটি। এটি লর্ড লিটনের 'লেডি অব আয়ন্‌স্'-এর প্রভাবে পরিপুষ্ট। এটি একটি সামাজিক নাটক। তাঁর প্রথম মৌলিক নাটক 'রামানুজ' (১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ)। এর বিষয়বস্তু হিসেবে তিনি নির্বাচন করেছিলেন দাক্ষিণাত্যে ধর্মাচার্য রামানুজের জীবনকথাকে। এই নাটকটি সম্পর্কে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, -

> "যে ভক্তিবোধ বাঙ্গালী দর্শকের হৃদয় সহজেই অধিকার করিয়া থাকে, ইহাতে তাহার আবেদন খুব সার্থক বলিয়া মনে হইবে না হইবে না।"[২]

ফলত তাঁর প্রথম মৌলিক নাটক সেভাবে পাঠক মনে আলোড়ন তুলতে পারেনি। এরপর তিনি রচনা করেন 'রাখী-বন্ধন' নামক একটি ঐতিহাসিক নাটক। তাঁর রচিত অন্যান্য ঐতিহাসিক নাটকগুলি হল - 'অযোধ্যার বেগম', 'মগের মুলুক' ইত্যাদি। শুধু ঐতিহাসিক নাটক নয়, তিনি রচনা করেছিলেন 'চরিত শ্রেণীর'[৩] নাটক, নাম 'চণ্ডীদাস' (১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ)। বিষয়বস্তু হল কবি চণ্ডীদাস ও রজকিনীর প্রচলিত প্রণয় কথা। তিনি রচনা করেন 'আনুপূর্বিক রোমান্টিক'[৪] নাটক 'ইরানের রাণী'। এছাড়াও তাঁর রচিত আরও কয়েকখানি নাটক হল 'মন্ত্রশক্তি', 'মা', 'পোষ্যপুত্র'। এই তিনটি নাটকের তিনি নাট্যরূপ দিয়েছিলেন অনুরূপা দেবীর উপন্যাসকে অবলম্বন করে। লিখেছিলেন 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বছর'। এটি তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনী। তাঁর রচিত প্রথম মৌলিক পৌরাণিক নাটক হল 'কর্ণার্জ্জুন' (১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ)। এরপর রচনা করেন 'শ্রীকৃষ্ণ', 'পুষ্পাদিত্য', 'শকুন্তলা' ইত্যাদি। তাঁর রচিত পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক হল 'ছিন্নহার'। কৌতুক-নাটকের জগতে তাঁর অবদান 'দুমুখো সাপ'। গীতিনাট্যের ক্ষেত্রকে তিনি উপহার দিয়েছিলেন 'অপ্সরা', 'সুদামা' ইত্যাদি। আমরা যদি তাঁর সাহিত্য জীবনকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধানের চেষ্টা করি তাহলে দেখতে পাবো যে সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পদচারণা করেছেন তিনি খুব সাবলীল ছন্দেই। তবে মৌলিকতার দিক দিয়ে খুব বেশি সফল হতে পারেনি। গিরিশচন্দ্র ঘোষের অনুকরণই হয়ে উঠেছে তাঁর সাহিত্য জীবনের মূল চালিকা-শক্তি। ফলত মৌলিকতার অভাব লক্ষ করা গেছে তাঁর সাহিত্যকর্মে। এ প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্যটি উল্লেখ্য, -

> "মৌলিক প্রেরণার মত পরানুকরণ কদাচ শক্তিশালী হইতে পারে না। সেই জন্য রচনার দিক দিয়াও অপরেশচন্দ্রের মধ্যে সর্বত্রই শৈথিল্যের পরিচয় পাওয়া যায়।"[৫]

তাসত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের ধারাটিকে নাটকে যাঁরা জীবন্ত করে তুলেছিলেন তাঁদের মধ্যে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 75
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 602 - 610
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বিশ শতকের প্রথমার্ধে অপর একজন নাট্যকার, যিনি কর্ণ ও অর্জুনকে তাঁর নাটকের প্রধান চরিত্র করে তুলেছিলেন, তিনি হলেন কেশব সেন। কিন্তু আমরা সাধারণভাবে কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু কেশবচন্দ্র সেন ও 'কর্ণার্জ্জুন' নাটকের রচয়িতা কেশব সেন এক ব্যক্তি নন। কেশবচন্দ্র সেন জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯ ডিসেম্বর ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে এবং পরলোক গমন করেন ৮ জানুয়ারি ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে। অন্যদিকে কেশব সেন তাঁর 'কর্ণার্জ্জুন' নাটকটি রচনা করেন ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে, আগস্ট মাসে। সময়ের এই পরিসংখ্যান ও আমাদের সংগৃহীত বিভিন্ন তথ্যের অনুসন্ধান একথা প্রমাণ করে যে, দুই কেশব সেন এক ব্যক্তি নন। তাঁর ব্যক্তিজীবন এবং সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে আমরা বিশেষ কোনো তথ্যই হাতে পাইনি। তবে আমাদের আলোচ্য 'কর্ণার্জ্জুন' নাটকটির মধ্য দিয়ে তাঁর চিন্তা ভাবনার জগতকে আমরা খুঁজে দেখার চেষ্টা করব। তুলে ধরবার প্রয়াস করব দুই নাট্যকারের নাটক রচনার ভিন্ন অভিপ্রায় ও পৃথক মতামতকে।

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য 'কর্ণার্জ্জুন' (১৩৩০, কার্ত্তিক)। আর্ট লিমিটেডের তত্ত্বাবধানে স্টার থিয়েটারে প্রথম এই নাটকের অভিনয় হয় ১৪ আষাঢ়, ১৩৩০ বঙ্গাব্দে, শনিবারে। গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশিত হয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স কর্তৃক। তিনি এটি উৎসর্গ করেন নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় কবিভূষণকে। নাটকটিতে রয়েছে পাঁচটি অঙ্ক ও একত্রিশটি দৃশ্য। অন্যদিকে কেশব সেন রচিত 'কর্ণার্জ্জুন' (১৯৪৭, আগস্ট) নাটকটি সুভাষচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল দেব সাহিত্য কুটির প্রাইভেট লিমিটেড থেকে। এটির গান রচনা করেছিলেন সুনির্মল বসু। নাটকটির প্রচ্ছদপট থেকে জানা যায় এটি স্ত্রী ভূমিকা বর্জিত নাটক। নাটকের নারী চরিত্রের অনুপস্থিতি চোখে পড়ে। অপরদিকে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'কর্ণার্জ্জুন' নাটকে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র অলঙ্কৃত করেছেন পার্বতী, কুন্তী, দ্রৌপদী, সুকেতু, পদ্মাবতী, নিয়তি, ভৈরবী প্রমুখরা। ফলত প্রথমেই নাটক দুটি গঠনগত পার্থক্য পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না।

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত 'কর্ণার্জ্জুন' নাটকে সূচনাতেই দেখা যায় গঙ্গাস্নাত যজ্ঞের হবি সংগ্রাহক অগ্নিদেব এক শূদ্র ব্যক্তিকে সংস্পর্শ দোষে দোষী করে রাজার কাছে নিয়ে যেতে চান। তখন তিনি কর্ণের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কর্ণ অগ্নিদেবকে জানান যে তিনি যজ্ঞের হবি দশগুন পরিমাণে দেবেন। কিন্তু বর্ণ কৌলীন্যের গৌরবে অহংকারী অগ্নি জানান,-

> "আমি দ্বিজ, বর্ণশ্রেষ্ঠ, আর এ ব্যক্তি অস্পৃশ্য চণ্ডাল - এতে আমাতে সম-পর্য্যায়?"[৬]

এ থেকে বোঝা যায় যে তৎকালীন সমাজ কতটা বর্ণভেদের ভারে নুইয়ে পড়েছিল। কিন্তু এই সমাজের বর্ণভেদের বেড়াজাল ছিন্ন করতে চেয়েছিলেন কর্ণ। প্রশ্ন করেছিলেন, -

> "এ শাস্ত্রের বিধান, না দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার? কেন এ পার্থক্য? আমি সংস্কার-বর্জিত সূতপুত্র; হীন-কুলে জন্ম ব'লে কি উচ্চ অধিকার নেই? আমি চিরদিনই কি হীন হ'য়ে থাক্‌ব?"[৭]

শাস্ত্রের কথাকে তুলে ধরে কর্ণ এখানে বোঝাতে চেয়েছেন যে বংশ কৌলীন্যের নিয়ম শুধু সমাজেরই সৃষ্টি, যা শাস্ত্রের কোথাও উল্লেখিত নেই। একই কথা শ্রীচৈতন্যদেব বলেছিলেন ষোড়শ শতকের সামাজিক পটভূমিতে দাঁড়িয়ে। এই জাতিভেদের করাল গ্রাসে স্বয়ং কর্ণও ছিলেন জর্জরিত। সেই সামাজিক মন্বন্তর যখন অন্যের ওপর প্রকোপ ফেলেছে, তখন তিনি সোচ্চার হয়ে উঠেছেন জাতিভেদের বিরুদ্ধে। সমাজের এই কলঙ্ক মোচনের জন্য তিনি পিতা অধিরথের কাছে অনুমতি চেয়েছেন যাতে গুরু দ্রোণাচার্যের কাছে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। উদ্দেশ্য ছিল তার –

> "বাহুবলে সূতবংশ খ্যাতি
> চিরদিন
> ভারতের ইতিহাসে রহিবে অঙ্কিত।"[৮]

এই কর্ণ ছিলেন জাতিভেদের মতো সামাজিক ব্যাধি দূরীকরণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। অপরদিকে, কেশব সেন রচিত 'কর্ণার্জ্জুন' নাটকেও এই বর্ণ বৈষম্যের কথা আমরা জানতে পারি কর্ণ ব্রাহ্মণকে প্রণাম করতে গেলে ব্রাহ্মণ বলেছেন, -

> "...তোর স্পর্শে দেহ আমার অপবিত্র হ'ল! আবার আমাকে স্নান করে আসতে হবে।"[৯]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 75
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 602 - 610
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এমনকি কর্ণকে এই ব্রাহ্মণ পথ-চলতি কুকুরের থেকেও হীন বলে সম্বোধন করেছেন। অস্পৃশ্যতার অপমানে বিধ্বস্ত কর্ণ। দুই নাটকের কাহিনির প্রসঙ্গও ভিন্ন। কিন্তু অভিন্ন বর্ণভেদ প্রথা নামক সামাজিক ব্যাধির উল্লেখ। আসলে আমরা যদি দুটি নাটক রচনার সময়পর্বকে লক্ষ করি তাহলে দেখতে পাই তখন বিশ শতকে প্রথমার্ধ। দুই নাটকের সময়কাল ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। এই সময় বাংলার রাজনৈতিক আকাশে বিভিন্ন ঘটনার সমাবেশ ঘটেছে। অসহযোগ আন্দোলন, অর্থনৈতিক মন্দা গ্রাস করেছে জন্মভূমি ভারতবর্ষকে। তখন স্বাধীনতার প্রাগলগ্ন। যখন কেশব সেন 'কর্ণার্জ্জুন' রচনা করছেন ঠিক সেই সময়ে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করছে। ফলত এরকম এক বিভক্ত ক্ষয়িত সমাজের উল্লেখ তৎকালীন নাট্যকারদের লেখায় যে ধরা পড়বে, তা স্বাভাবিক।

সমাজের এই নিষ্ঠুর নিয়মের ফলে অনেকেই সমাজ থেকে হতেন বঞ্চিত। তাঁরা আশ্রয় পেতেন না সভ্য সমাজের আঙিনায়। অস্পৃশ্য হয়ে থেকে যেতেন তাঁরা। এমন পরিস্থিতি সেই মধ্যযুগের সময় থেকেই যেন সামাজিক পরিকাঠামোর একটা অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। এই সময় অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর কর্ণকে নির্মাণ করেছেন প্রকৃত আশ্রয় দাতারূপে। তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে মানবতার প্রকৃত বীজমন্ত্র। বর্ণভেদের নিষ্ঠুর নিয়মে আহত ওই শূদ্র ব্যক্তি যখন আশ্রয়হীন, কর্ণ তাঁকে আশ্রয় দিয়েছেন। আবার যখন সে আশ্রিত ব্যক্তি আক্রান্ত হয়েছেন তখন তিনি তাঁকে ভরসা দিয়েছেন, -

> "আমি তোমায় আশ্রয় দিয়েছি, যদি প্রয়োজন হয় আমি তোমার জন্য দণ্ডভোগ ক'র্‌ব। তুমি সর্বজাতির অস্পৃশ্য হ'লেও আমার অস্পৃশ্য নও। তুমি আমার শরণাগত, আমার ভাই।"[১০]

সকলকে ভ্রাতৃজ্ঞানে এই সম্বোধন স্বামী বিবেকানন্দের কথাকে মনে করায়। কর্ণও হয়ে উঠেছেন আর্তদের ভ্রাতা। যিনি নিজের আশ্রিতের জন্য কষ্ট স্বীকার করতেও রাজি। তাঁকে প্রকৃত আশ্রয়দাতা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে। অগ্নির হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করতে কর্ণ মানবতার মহান মন্ত্রকে দীপ্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন –

> "এই দেহ - মাংসপেশী শোণিত, আর এর অন্তরালে যে প্রাণ - তা ব্রাহ্মণ শূদ্রের ভেদশূন্য। তুমি চণ্ডাল হ'লেও - তোমাতে আর পৃথিবীর সর্ব্ব-মানবে কোন পার্থক্য নেই।"[১১]

সমাজে অন্তরঙ্গে যে ব্যাধির জন্ম হয়েছে, তা মনুষ্যসৃষ্ট। সব মানুষই সমান। কর্মের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে ভালো বা মন্দের নির্বাচন হতে পারে। তা কখনোই জন্মপরিচয়ের ভিত্তিতে কাঙ্ক্ষিত নয়। কর্ণ কর্মের জন্য শক্তিমান ব্যক্তিরূপে পরিচিত হয়েছেন। তাঁর সামর্থ্য তাঁর সেই শক্তির পরিচায়ক। আর প্রকৃত শক্তিমান তো তিনিই, যিনি আর্তকে উদ্ধার করতে পারেন, পীড়ন করেন না অসহায়কে। অগ্নি কর্ণের শক্তিকে ভয় পেয়ে জনৈক শূদ্রকে মুক্ত করে দেন। ফলত পীড়িতের উদ্ধার-কর্তা কর্ণ প্রকৃতই শক্তিমান। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কর্ণ জাতিভেদের নির্মম নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন কিন্তু কেশব সেনের নাটকে আমরা প্রতিবাদী কর্ণকে দেখিনা। বরং ব্রাহ্মণের কাছ থেকে অপমানিত হয়ে গঙ্গা জলে নিজের জীবন বিসর্জন দিতে চেয়েছেন তিনি। এ কর্ণ বিধ্বস্ত অপমানে, লাঞ্ছনায়।

জন্ম-কৌলীন্যের কারণে তিনি শুধুমাত্র অপমানিত হয়েছেন এমন নয়, বরং হয়েছেন অভিশপ্তও। দুইজন নাট্যকারই গুরুদেব কর্তৃক কর্ণের অভিশপ্ত হওয়ার কাহিনিকে তুলে ধরেছেন। তবে কেশব সেনের নাটকে গুরুদেব হলেন ভার্গব। অন্যদিকে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাটকে কর্ণের গুরুদেব হলেন জামদগ্নি। দুইজন গুরুদেবই কর্ণকে সমকক্ষ যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধের সময় তাঁদের প্রদত্ত বিদ্যা তাঁর বিস্মৃতির আবরণে আবৃত হবার অভিশাপ দিয়েছেন। কেশব সেন বিরচিত 'কর্ণার্জ্জুন' নাটকে গুরুদেব কর্ণের পরিচয় জানতে চাইলে তিনি নিজেকে 'জন্ম-ক্ষত্রিয়'[১২] নয়, 'কর্ম্ম-ক্ষত্রিয়'[১৩] বলে উল্লেখ করেছিলেন। পিতা অধিরথের গৃহে তাঁর বেড়ে ওঠার কথাও জানিয়েছিলেন। এই একই চিত্র অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাটকেও দেখা যায়। উভয় নাটকে স্পষ্ট কর্ণের গুরুভক্তি। গুরুদেবের অভিশাপ প্রদানের পর কর্ণ সেই অভিশাপকেই আশীর্বাদ বলে গ্রহণ করেছেন। গুরুভক্তির এমন জ্বলন্ত উদাহরণে গুরুদেবও চকিত হয়েছেন। তাই তাঁকে আশীর্বাদ করেছেন –

"শাপ দিনু তোরে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 75
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 602 - 610
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

তবু করি আশীর্ব্বাদ
এই অপকীর্ত্তি সনে
গুরুভক্তি তোর
ধরা-মাঝে চিরদিন রহিবে প্রচার।”[১৪]

অভিশপ্ত কর্ণকে গুরুদেবের এই বরদান অপরেশচন্দ্রের নাটকে উল্লেখ থাকলেও কেশব সেনের নাটকে তা অনুপস্থিত। উভয় নাটকে একাধিকবার অভিশপ্ত কর্ণের জীবনে নতুন এক অভিশাপ সংযোজনের করুণ প্রেক্ষাপট বর্ণিত হয়েছে। কর্ণ শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করলে তা সরোবরে জল পান করতে আসা একজন তাপসের মাতৃসমা গাভীর প্রণসংহার করেছে। সেই জনৈক ব্যক্তি তাঁকে অভিশাপ দিয়েছেন, -

“...যেন যুদ্ধকালে পৃথিবী তোর রথচক্র গ্রাস করে।”[১৫]

কেশব সেনের নাটকে এই কাহিনি অপরেশচন্দ্রের নাটকেও বর্তমান। তবে এই নাটকের কাহিনি থেকে জানা যায় কর্ণ যে মাতৃসমা গাভীকে হত্যা করেছিলেন তা মৃগ মনে করে। কেশব সেনের নাটকে এই মৃগ-ভ্রমের কথার উল্লেখ নেই। এখানে অনুপস্থিত গো-হত্যার প্রায়শ্চিত্তের কথাও। অপরদিকে অপরেশচন্দ্রের ‘কর্ণার্জ্জুন’ নাটকে প্রায়শ্চিত্তের নানা বিধির উল্লেখ লক্ষ করা যায়। একথা বলাই যায়, কেশব সেনের নাটকের কাহিনি বিন্যাসের সংক্ষিপ্ততাকে পূরণ করেছে অপরেশচন্দ্রের লেখনী।

মহাভারতের কৌরব ও পাণ্ডবদের অস্ত্রশিক্ষা প্রদর্শনীর প্রেক্ষাপট সুনিপুণ দক্ষতায় তুলে ধরেছেন উভয় নাট্যকারই। বিষয় এক হলেও কাহিনি উপস্থাপনে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। কেশব সেনের নাটকে দেখা যায় অস্ত্রশিক্ষায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের পরীক্ষায় অর্জুন সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন। গুরু দ্রোণাচার্য সকলের সামনে ঘোষণা করেছেন অর্জুন ‘যোদ্ধাগণ-মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।’[১৬] এমত পরিস্থিতিতে সেখানে আবির্ভাব ঘটেছে কর্ণের। তিনি গুরুদেবকে বলেছেন, -

“সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নয়, যোদ্ধাগণের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ তোমার অর্জ্জুন।”[১৭]

শুরু হয়েছে গুরু দ্রোণের সঙ্গে তাঁর বাক্-বিতণ্ডা। অবশেষে তা উন্নীত হয়েছে প্রতিযোগিতার পর্যায়ে। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছেন কর্ণ ও অর্জুন। কিন্তু তখনই অর্জুন কর্ণকে প্রশ্ন করেছেন, -

“অজ্ঞাত-কুলশীল যুবক, ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজবংশের কুমার আমি - আমার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হও, কি তোমার পরিচয়?”[১৮]

কর্ণ নিজেকে ধনুকধারী বলে পরিচয় দিয়েছেন। অর্জুন এর অতিরিক্ত পরিচয় জানতে চাইলে কর্ণ বলেছেন, -

“অস্ত্রবিদ্যা আমার আয়ত্ত - শক্তিধর আমার বাহু। এই পরিচয়ে - এই সম্পদে আমি পৃথিবী জয় করে আস্‌তে পারি।”[১৯]

অর্জুন তখন প্রত্যুত্তরে বলেছেন, -

“যেদিন পৃথিবী জয় করে ফিরে আস্‌বে, সেদিন না হয় তোমায় প্রতিযোগী বলে মান্য কর্‌ব। কিন্তু বংশ-পরিচয়হীন রবাহুত! আজ তোমার কোন মর্য্যাদাই আমি স্বীকার কর্‌তে পারি না।”[২০]

এহেন অপমানে কর্ণ তাঁকে প্রতিযোগিতার পরিবর্তে আহ্বান জানিয়েছেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার। সেখানেও অর্জুন তাঁর সাথে যুদ্ধ করতে নারাজ। কর্ণ নিজেকে পরিচয় দিয়েছেন ভার্গবের শিষ্য বলে। আরও জানিয়েছেন, -

“আচার্য্যের সকাশে আত্মপরিচয় গোপন করেই আমি অস্ত্রশিক্ষা লাভ করেছিলাম।”[২১]

এই কথা শুনে অর্জুন তাঁকে তিরস্কার করেছেন। কিন্তু তাঁর বীরত্ব ও শৌর্যের পরিচয় পেয়ে দুর্যোধন অঙ্গরাজ্য প্রদানের মধ্য দিয়ে স্বীকৃতি দিয়েছেন তাঁকে বন্ধুরূপে। অন্যদিকে, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ‘কর্ণার্জুন’ নাটকেও শিক্ষা প্রদর্শনী

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 75
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 602 - 610
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মঞ্চে অর্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছেন কর্ণ। অর্জুনের মতো কেউ শর নিক্ষপ করতে পারে কিনা - শকুনির এই প্রশ্নের উত্তরে অস্ত্র হাতে সভা মাঝে উপস্থিত হয়েছেন কর্ণ। নিজের পরিচয় দিয়েছেন –

"কর্ণ নাম,
অঙ্গদেশে বাস,
পরিচয় –
ভুবন-বিখ্যাত বীর
নবরূপী ভগবান্ জামদগ্ন্য-শিষ্য আমি।"[২২]

উভয় নাটকে দুজনেই গুরুদেবের শিষ্য বলেই প্রথমে পরিচয় দিয়েছেন নিজের। এরপর অপরেশচন্দ্রের নাটকে আমরা দেখি কর্ণ গুরু দ্রোণকে প্রণাম জানিয়েছেন। সভা মাঝে নিবেদন জানিয়েছেন তাঁর অস্ত্রশিক্ষা প্রদর্শনের অনুমতি চেয়ে। কেশব সেন অঙ্কিত কর্ণের থেকে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নির্মিত কর্ণ অনেক বেশি কোমল স্বভাবযুক্ত। কেশব সেনের কর্ণ যেখানে উগ্রতার পরিচয় দিয়েছেন, অপরেশচন্দ্রের কর্ণ সেখানে প্রথমে বিনয়ের মাধ্যমেই প্রার্থনা জানিয়েছেন। এই নাটকে কৃপ কর্ণের কাছে তাঁর পরিচয় জানতে চেয়েছেন। অন্যদিকে কেশব সেনের নাটকে কর্ণের পরিচয় জানতে চেয়েছিলেন স্বয়ং প্রতিদ্বন্দ্বী অর্জুন। তবে উভয় নাটকে এই ঘটনার পরিণতি একই। অবশেষে দুর্যোধন কর্ণের বাহুবলের জন্যই তাঁর দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাঁকে অঙ্গরাজ্যের রাজা করেছেন। অপরেশচন্দ্রের কাহিনি বর্ণনায় দেখি দুর্যোধনের উপকারে কর্ণ আজীবন তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছেন। জানিয়েছেন, -

> "আজ হ'তে আমারও প্রতিজ্ঞা, আমি রণক্ষেত্রে তোমার শত্রু সংহার কর্‌ব, উৎসবে বেসনে বিচার - পরিশূন্য হ'য়ে তোমার আজ্ঞা পালন কর্‌ব। জীবনের অপেক্ষাও শ্রেয় – মর্য্যাদা; এই সভাস্থলে সেই মর্য্যাদা আমায় দান ক'রে তুমি আমার জীবনকে ধন্য ক'রেছ, আমিও আজ হ'তে এই জীবন তোমাকেই উৎসর্গ ক'র্‌লেম।"[২৩]

কর্ণ আজীবন প্রতিশ্রুত হয়েছেন। দুর্যোধনের উপকারের সংকল্প গ্রহণ করেছেন। তাঁর এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণের বিষয়টি স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়নি কেশব সেনের নাটকে। তবে সেখানেও কর্ণের কাজ-কর্মের মধ্য দিয়ে তার আভাস পাওয়া যায়। সেখানে অনুপস্থিত অস্ত্রশিক্ষা প্রদর্শনীতে কর্ণকে দেখার পর কুন্তীর অবস্থার বর্ণনাও। তা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও। তিনি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন জতুগৃহ-দাহের ঘটনাকে। সেখান থেকে মাতা কুন্তী সহ পঞ্চপাণ্ডবের পলায়নের কথাও যেমন জানা যায়, তেমনি তাঁদের পলায়ন সংবাদ পেয়ে ভীষ্ম, বিদুর, শকুনি দুর্যোধনদের প্রতিক্রিয়াও স্পষ্ট। অপরদিকে, যুধিষ্ঠির ও ভীমের কয়েকটি সংলাপেই এই ঘটনার বর্ণনা করেছেন কেশব সেন। তবে উভয় নাটকে এই ঘটনায় কর্ণের প্রতিক্রিয়া কোথাও ব্যক্ত হয়নি।

উভয় নাটকেই কর্ণের সক্রিয় উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় কেশব সেনের নাটকে দেখা যায় ধৃষ্টদ্যুম্ন অঙ্গরাজ কর্ণকে লক্ষ্যভেদ করতে নিষেধ করেছেন। কারণ হিসাবে জানিয়েছেন, -

> "আমার ভগিনী বংশ-পরিচয়হীনের স্বয়ম্বরা হ'তে অসম্মতা।"[২৪]

একথা শুনে কর্ণ সভা-মাঝেই আবৃত হয়েছেন এক গভীর নৈরাশ্য ও হতাশায়। অপরদিকে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাটকে কর্ণকে লক্ষ্যভেদ থেকে দূরে থাকবার কথা বলেছেন স্বয়ংবরা দ্রৌপদী –

> "আমি ক্ষত্রিয়কুমারী - ক্ষত্রিয় কিংবা ব্রাহ্মণের গলে বরমাল্য অর্পণই আমাদের কুলপ্রথা। সকলে শুনুন – ভাতৃপ্রতিজ্ঞা-বশে সূতকে বরণ করবার পূর্ব্বে আমি অনলে জীবন বিসর্জ্জন দেব।"[২৫]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 75
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 602 - 610
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

দ্রৌপদীর কথায় অপমানিত কর্ণ সেইক্ষণেই সভা ত্যাগ করে চলে যান। কেশব সেনের নাটকে স্বয়ংবর সভার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ নেই, যা আছে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাটকে। স্বয়ংবর সভায় দ্রৌপদীর করা অপমান কর্ণকে কখনই ভুলতে পারেন নি। দ্যুত সভায় যখন যুধিষ্ঠির নিজেকে সহ তাঁর পাঁচ ভাইকে বাজি রেখে হেরে গেছেন, তখন দুর্যোধন বলেছেন –

"কহ যুধিষ্ঠির,
আর কিবা করিবে হে পণ?"[২৬]

সেই মুহূর্তেই কর্ণ বলেছেন – "আছে মাত্র দ্রৌপদী সম্বল!"[২৭] কর্ণ আ-জীবন সূতপুত্র বলে অপমানিত হয়েছেন। অস্ত্রশিক্ষার প্রদর্শনী, স্বয়ংবর সভা - সমস্ত ক্ষেত্রেই। তাই ক্রোধান্বিত কর্ণ। কিন্তু ক্রোধের বসে একদিন মানবতার বীজমন্ত্রের উচ্চারক কর্ণ মনুষ্যত্ব হারিয়ে উচ্চারণ করেছেন দ্রৌপদীকে দ্যুতসভায় বাজি ধরার কথা। যা কর্ণকে সর্বকালের সর্বজনের চোখে সম্মানের আসন থেকে একটানে নামিয়ে এনে অসম্মানের কন্টকাসনের অধীশ্বর করে তুলেছে। দাতা কর্ণের মহিমা রংহীন হয়ে গেছে দ্যুতসভায় অহংকারী, বিবেকহীন কর্ণের কারণে। দ্রৌপদীর প্রতি তাঁর ক্রোধের কারণ বুঝে নিতে পাঠকদের অসুবিধা হয় না যখন কর্ণ বলেন –

"মনে পড়ে,
সূতপুত্রে বরিব না কভু "[২৮]

এ কর্ণ রাজা বা দাতা কর্ণ নন। ইনি ক্রোধে উন্মত্ত অহংকারী পুরুষ, যিনি এক নারীর প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা উন্মোচন করেছেন সেই নারীর অসহায় অবস্থায়। এই বিষয়ে কর্ণের এমন অমানবিক অভিব্যক্তি তাঁর চরিত্রকে করেছে কালিমালিপ্ত। দ্যুতসভার উল্লেখ নেই কেশব সেন রচিত 'কর্ণার্জ্জুন' নাটকে।

কর্ণ যিনি রাজার থেকেও বেশি দাতা হিসেবে পরিচিতি, তাঁর সেই দানশীল স্বরূপটির উদ্ঘাটন ঘটেছে দুই নাট্যকারের লেখনীর মধ্য দিয়ে। কর্ণ তাঁর গৃহে আগত কোনো প্রার্থীকে খালি হাতে ফেরাতেন না কখনোই। একদিন শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে এসে পুত্র বৃষকেতুর মাংস ভক্ষণের জন্য আর্জি জানান। ব্রাহ্মণকে দেওয়া কথা রাখতে সস্ত্রীক কর্ণ চোখের জল না ফেলে সন্তানকে বলি দেন। সত্যরক্ষক কর্ণের এই স্বরূপটি লক্ষ করে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে দাতাকর্ণ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। পিতা কর্ণের পরাজয় ঘটেছে সত্যরক্ষক কর্ণের কাছে। তিনি হয়ে উঠেছেন সবথেকে বড়ো দাতা – দাতা কর্ণ। বৃষকেতুকে বলিদানের বিষয়টি দুটি নাটকেই রয়েছে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে দৈববাণীর উল্লেখ আছে শুধুমাত্র অপরেশচন্দ্রের 'কর্ণার্জ্জুন' নাটকে। তাঁর দাতা স্বরূপের পরিচয় আরও একবার পাই ব্রাহ্মণ ছদ্মবেশী ইন্দ্র যখন তাঁর কাছে কবচ-কুণ্ডলের প্রার্থনা জানান। তাঁর দানবীর রূপটির সঙ্গে সত্যরক্ষক সত্তার স্বরূপটি অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত। ছদ্মবেশী ইন্দ্রদেবকেও কথা দিয়েছিলেন তিনি তাঁর প্রার্থিত বস্তু দান করবার। ইন্দ্রদেবের প্রার্থনা কি তা না জেনেই তিনি প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন তিনি। তাই প্রার্থিত বস্তুর স্বরূপটি জানার পর কর্ণ বলেছেন –

"বাক্য যবে করিয়াছি দান,
তুচ্ছ কবচ-কুণ্ডল –
অকাতরে দিব উপহার চরণে তোমার।"[২৯]

ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ ইন্দ্রদেবের আশীর্বাদে অঙ্গছেদে প্রাণনাশ না হলেও কবচ-কুণ্ডলদানে মৃত্যু উপস্থিত হয়েছে তাঁর শিয়রে। তা সত্ত্বেও নির্বিকার চিত্তে তিনি দান করেছেন। যিনি সত্য রক্ষা করতে নিজের প্রাণ দান করে দেন, তার থেকে বড়ো দানবীর আর কে বা হতে পারেন। কর্ণের এই দাতা স্বরূপটি উভয় নাট্যকারই খুব সযত্নে অঙ্কন করেছেন।

কর্ণের অন্য আর একটি বৈশিষ্ট্য হল তাঁর বন্ধুর প্রতি আনুগত্য। বন্ধু দুর্যোধনের জন্য ভানুমতির স্বয়ংবরে তিনি জয়লাভ করতে চেয়েছেন। লক্ষ্যভেদ করে ভানুমতীকে তুলে দিয়েছেন দুর্যোধনের হাতে। এ জন্য ভাগদত্ত বলেছিলেন, -

> "ধন্য - শতধন্য তুমি কর্ণ! তোমার বন্ধুবাৎসল্য তোমার দানশীলতার মতোই বিশ্ববিশ্রুত হয়ে থাকবে। নরকুলমধ্যে তুমি নরোত্তম।"[৩০]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 75
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 602 - 610
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বন্ধুর সুখের জন্য কর্ণ শুধু স্বয়ংবরসভার লক্ষ্যই ভেদ করেননি, বরং যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। তাই দ্রোণাচার্য বধের পর কর্ণ কৌরব শিবিরের সেনাপতির উত্তর দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। অর্জুন সংকল্প করেছেন কর্ণবধের। এমত অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের স্বগতোক্তিই প্রমাণ করে কর্ণের বীরত্বের –

> "ভারত যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ ক'র্‌ব না; কিন্তু সমস্ত অস্ত্রের ধার-মুখে আমি। অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা ক'রলে, কর্ণ বধ ক'র্‌ব; কিন্তু কর্ণ তো সামান্য বীর নন্। সহজাত কবচ-কুণ্ডলধারী জামদগ্ন্য শিষ্য কর্ণকে বধ ক'র্‌তে দেবতারাও পারেন কিনা সন্দেহ। অর্জ্জুনের পক্ষে একা কর্ণবধ অসম্ভব। আর যদিও অর্জ্জুন কোনরূপে কর্ণের শৌর্য্য সহ্য ক'র্‌তে পারে – যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব অগ্নিমুখে তৃণের মত কর্ণের শরানলে দগ্ধ হবে।"[৩১]

শুধু তাই নয়, কর্ণকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে রাখতে মাতা কুন্তীকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছেন। কর্ণের বীরত্ব তথা যোদ্ধা-সত্তার নিবারণ যে সহজ নয়, সে কথা কৃষ্ণ জানতেন। তাইতো কৃষ্ণ বলেছেন –

> "কুন্তী তোমার এই মমতাই তোমার পুত্রনাশের কারণ হবে। একা অর্জ্জুনের সাধ্য কি কর্ণকে বধ করে! ...কুন্তী! তুমি, আমি, ইন্দ্র, মেদিনী, রামের অভিশাপ এবং অর্জ্জুন এই ছয়জনের দ্বারাই কর্ণ বধ হবে।"[৩২]

একা একজন যোদ্ধাকে বধ করতে এই বৃহৎ আয়োজন কর্ণের বীরত্বকেই প্রমাণ করেছে। এই কর্ণ প্রকৃত যোদ্ধা। তিনি নিজে বীর হয়ে অর্জুনকে যথার্থ সম্মান প্রদান করেছেন। প্রশংসা করেছেন তাঁর 'বাণশিক্ষা'[৩৩] র। 'কর্ণার্জ্জুন' নাটকে এক মহারথীর অপর এক মহারথীকে এই সম্মান প্রদর্শন খুব সচেতন ভাবেই তুলে ধরেছেন নাট্যকার কেশব সেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সমাগত। যুদ্ধের প্রাক্কালে কুন্তী কর্ণকে জানিয়েছেন, "আমি রে জননী তোর।"[৩৪] শিয়রে প্রাণনাশী যুদ্ধ। এর দুই পক্ষে রয়েছেন কর্ণ ও অর্জুন। এই সময় অর্জুনের সঙ্গে তাঁর এই আত্মীয়তা তাঁকে দোলাচলতার মধ্যে ফেলেছে। মায়ের ভালোবাসার কাঙাল কর্ণ। তাসত্ত্বেও ভাতৃপ্রীতি, মাতৃস্নেহ সবকিছু উপেক্ষা করেই সত্য রক্ষায় আবদ্ধ কর্ণ। তিনি মাতা কুন্তীকে জানিয়েছেন –

"শুধু রাখিতে সম্মান তব,
করি পণ
এই যুদ্ধে হয় পার্থ নয় কর্ণ
ধরা হ'তে লহবে বিদায় –
তুমি রবে চিরদিন পঞ্চ-পুত্রের জননী!"[৩৫]

তাঁর চির-প্রতীক্ষিত মাকেও তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন। প্রত্যাখ্যান করেছেন সেই বংশ পরিচয়কে, যা তাঁকে ক্ষত্রিয়ের সম্মান দিতে পারত। পরিবর্তে গ্রহণ করেছেন সুতপুত্রের আজীবন সংগ্রাম ও সত্যরক্ষা হেতু জীবনের মূল্যে সমাগত মৃত্যুকে। উভয় নাট্যকারই কর্ণের এই করুণ পরিণতিকে তুলে ধরেছেন তাঁদের রচিত নাটকে। কেশব সেন নাটকের সমাপ্তিতে অর্জুনের কণ্ঠে শোনা যায় কর্ণ 'পান্ডব শ্রেষ্ঠ'[৩৬]। অন্যদিকে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাটকে কৃষ্ণর কাছে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে কর্ণের জীবনদীপ নির্বাপিত হতে দেখা যায়।

উভয় নাট্যকারই তাঁদের নাটক রচনার ক্ষেত্রে কর্ণকে নির্বাচন করেছেন এক বীর যোদ্ধা, দাতা, বন্ধু-বৎসল ব্যক্তিরূপে। উভয় নাটকের এই তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে কেশব সেন যেখানে কাহিনির পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন সংক্ষিপ্ত অবয়বে, সেখানে অপরেশচন্দ্র তার বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে কর্ণের জীবনের টুকরো টুকরো ঘটনার পরিনতির বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে অপরেশচন্দ্রের নাটকে। তাই কেশব সেন রচিত 'কর্ণার্জ্জুন' ও অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি-রচিত 'কর্ণার্জ্জুন' নাটক দুটিকে একে অপরের পরিপূরক বললে ভুল হয় না।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 75
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 602 - 610
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Reference:

১. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, *বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস* (২য় খণ্ড), এ.মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৩৬৮, পৃ. ৩৩৮
২. তদেব, পৃ. ৩৩৯
৩. তদেব, পৃ. ৩৪০
৪. তদেব, পৃ. ৩৪১
৫. তদেব, পৃ. ৩৪৩
৬. মুখোপাধ্যায়, অপরেশচন্দ্র, *কর্ণার্জ্জুন*, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স্, কলকাতা, ১৩৩০, পৃ. ৪
৭. তদেব, পৃ. ৫
৮. তদেব, পৃ. ৫
৯. সেন, কেশব, *কর্ণার্জ্জুন*, দেব সাহিত্য-কুটির প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা, ১৯৪৭, পৃ. ১
১০. মুখোপাধ্যায়, অপরেশচন্দ্র, *কর্ণার্জ্জুন*, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স্, কলকাতা, ১৩৩০, পৃ. ৪
১১. তদেব, পৃ. ৪
১২. সেন, কেশব, *কর্ণার্জ্জুন*, দেব সাহিত্য-কুটির প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা, ১৯৪৭, পৃ. ৬
১৩. তদেব, পৃ. ৬
১৪. মুখোপাধ্যায়, অপরেশচন্দ্র, *কর্ণার্জ্জুন*, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স্, কলকাতা, ১৩৩০, পৃ. ১৮
১৫. সেন, কেশব, *কর্ণার্জ্জুন*, দেব সাহিত্য-কুটির প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা, ১৯৪৭, পৃ. ৮
১৬. তদেব, পৃ. ১৫
১৭. তদেব, পৃ. ১৫
১৮. তদেব, পৃ. ১৫-১৬
১৯. তদেব, পৃ. ১৬
২০. তদেব, পৃ. ১৬
২১. তদেব, পৃ. ১৮
২২. মুখোপাধ্যায়, অপরেশচন্দ্র, *কর্ণার্জ্জুন*, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স্, কলকাতা, ১৩৩০, পৃ. ৩০
২৩. তদেব, পৃ. ৩৪
২৪. সেন, কেশব, *কর্ণার্জ্জুন*, দেব সাহিত্য-কুটির প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা, ১৯৪৭, পৃ. ২৬
২৫. মুখোপাধ্যায়, অপরেশচন্দ্র, *কর্ণার্জ্জুন*, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স্, কলকাতা, ১৩৩০, পৃ. ৪৯
২৬. তদেব, পৃ. ৮৭
২৭. তদেব, পৃ. ৮৭
২৮. তদেব, পৃ. ৯৬
২৯. তদেব, পৃ. ১৬১
৩০. সেন, কেশব, *কর্ণার্জ্জুন*, দেব সাহিত্য-কুটির প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা, ১৯৪৭, পৃ. ৪৩
৩১. মুখোপাধ্যায়, অপরেশচন্দ্র, *কর্ণার্জ্জুন*, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স্, কলকাতা, ১৩৩০, পৃ. ১৪৩
৩২. তদেব, পৃ. ১৪৬
৩৩. সেন, কেশব, *কর্ণার্জ্জুন*, দেব সাহিত্য-কুটির প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা, ১৯৪৭, পৃ. ৫৩
৩৪. মুখোপাধ্যায়, অপরেশচন্দ্র, *কর্ণার্জ্জুন*, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স্, কলকাতা, ১৩৩০, পৃ. ১৫০
৩৫. তদেব, পৃ. ১৫৫
৩৬. সেন, কেশব, *কর্ণার্জ্জুন*, দেব সাহিত্য-কুটির প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা, ১৯৪৭, পৃ. ৫৫